



চন্দন সেনগুপ্তের নাটক 'সাদা পায়রার জন্য': যুদ্ধ এবং মানবিকতার দ্বন্দ্ব

পূর্ববী দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত

ড. বরুণ কুমার সাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত

Received: 24.09.2026; Accepted: 28.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Chandan Sengupta is a brilliant star of Tripura's Bengali theatre. As an active member of Tripura's 'Natyabhumi' (1993) he has always taken the drama practice forward on the path of progress. After his death in 1996, 'Natyabhumi' has been celebrating the 'Chandan Sengupta Memorial Drama Festival' to keep his memory alive. The main subject of Chandan Sengupta's plays is the story of ordinary people who fall victim to various crises and hostile environments created by political interests. In the context of World War 2, Chandan Sengupta has perfectly depicted the great hardships that the war had caused to ordinary people's lives in his play 'Sada Payrer Jonya'. Chandan Sengupta has described in his play how the Germans, burned by the fire of revenge as a result of the Treaty of Versailles, brutally tortured the French, and how the cruel rules of war, the conflict of me versus you, revenge, and ego gradually violated the humanity of the soldiers, destroyed their conscience, and turned them into barbarity. In addition, to bid farewell to these interests, conflicts, and violence of the state, the playwright is calling on the youth to jump into another war, which will be a war for the white pigeon, that is, for peace, for great unity. The purpose of this research work is to highlight how he rose above political interests by uprooting the cruelty, brutality, and conflicts of war in the context of the state war in the play 'Sada Payrer Jonya', and declared the triumph of love and humanity.

Keywords: Chandan Sengupta, Sada Payrer Jonya, Treaty of Versailles, revenge, peace, humanity.

ত্রিপুরার নাট্যজগতে চন্দন সেনগুপ্ত (১৯৪৫-১৯৯৬) হলেন এমন একজন প্রভাবশালী নাট্যব্যক্তিত্ব যিনি নাটক রচনার পাশাপাশি বিশিষ্ট নাট্যকর্মী হিসেবে নিজ অবদান রেখে গেছেন। তিনি মোট এগারোটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, এগারোটি একাঙ্ক নাটক এবং কয়েকটি পথনাটিকা লিখে ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের পরিসরকে আরও বিস্তৃতি দান করেছেন। নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল, যার জন্য তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতেন। তার পাশাপাশি তিনি নাটকের গঠন প্রকৃতি নিয়ে নানা ভাবনায় মেতে থাকতেন। তাঁর লিখিত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল— 'জীবনের মানে', 'সাদা পায়রার জন্য', 'অন্য পৃথিবী', 'আরোহণ', 'প্রসঙ্গ: হরধনু', 'সব্যসাচী', 'সোনার হরিণ', 'তাম্রপত্র', 'ভূমিজ', 'ডেডলেটার' ও 'চাওয়া'। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলি

হল— 'ইসকাননের বিবি', 'সূর্য উঠবে বলে', 'ভোট', 'কর্তার ভূত', 'জন্মদিন', 'একটি দিন একটি স্বপ্ন', 'এখনো মানুষ', 'রং চোর', 'অমৃত', 'আজকের নিলাম' এবং 'জলছবি'।

চন্দন সেনগুপ্ত ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট পথিকৃত ছিলেন। ১৯৮০ সালে খোয়াইয়ে নাট্য আন্দোলনের গতিশীলতা যখন বেড়ে ওঠে সেইসময় কমল রায়চৌধুরী, হীরেন্দ্র সিংহা, সমীর রায়, সঞ্জয় কর প্রমুখ নাট্যকর্মীদের সাথে চন্দন সেনগুপ্তও নাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়ে যান। সঞ্জয় কর তাঁর 'নাট্য আন্দোলনে খোয়াই' (২০০২) প্রবন্ধে লিখেছেন—

“খোয়াইয়ের আর একজন কৃতি নাট্যকার যিনি বাংলা নাটকের ভাণ্ডারকে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন— চন্দন সেনগুপ্ত 'সাদা পায়রার জন্য' লিখেই প্রথম আলোড়িত করেছেন সমগ্র নাট্যাঙ্গনকে। এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৯৯৬) তিনিই ছিলেন ত্রিপুরার সবচেয়ে ব্যস্ত নাট্যকার।”^১

১৯৯৩ সালে ভালো নাটক করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে 'নাট্যভূমি' নাট্যদলটি। ১৯৯৩ সালের ২৬শে আগষ্ট 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন'-এ 'নাট্যভূমি'র প্রযোজিত প্রথম নাটকটিই ছিল চন্দন সেনগুপ্তের 'আরোহণ' নাটক এবং এর নির্দেশনায় ছিলেন নাট্যপরিচালক সঞ্জয় কর। 'নাট্যভূমি'-র প্রারম্ভকাল থেকেই খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই জড়িত ছিলেন চন্দন সেনগুপ্ত। নাটক কতটা সুন্দরভাবে দর্শকদের সামনে পরিবেশন করা যায় তা নিয়ে তিনি সর্বদা চিন্তিত। নাট্যপরিচালক সঞ্জয় কর জানিয়েছেন—

“নাট্যভূমি গড়ার পেছনে অন্য অনেকের মধ্যে যিনি ছিলেন প্রেরণার মূল উদ্যোগী তিনি নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত।”^২

১৯৯৬ সালে 'নাট্যভূমি'র আয়োজিত দ্বিতীয় 'উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় নাট্যোৎসব' যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই সময় হঠাৎ চন্দন সেনগুপ্তের প্রয়াণ ঘটে। তারপর থেকেই এই আয়োজনটি তাঁর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত করা হল।

চন্দন সেনগুপ্তের নাটকের আদ্য-প্রান্ত জুড়ে রয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা, দেশ বিভাগ, বেকারত্ব, যুদ্ধ, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিহিংসা প্রভৃতি। সমকালীন সমাজের জটিল সংকট তাঁর নাটকের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর 'সাদা পায়রার জন্য' এমন-ই একটি বিশিষ্ট নাটক, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির উগ্রজাতীয়তাবাদ ফরাসিদের জীবনকে কিভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছিল তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের হৃদয়ে যে শক্তি কাজ করে, তা একজন জার্মান মেয়ে এবং একজন ফরাসী যুবকের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আলোচ্য নাটকটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় খোয়াই টাউন হলে ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে Govt. Employees Recreation Club কর্তৃক হীরেন্দ্র সিংহার নির্দেশনায়। বারোটি দৃশ্য এবং ছয়টি অন্তর্দৃশ্য নিয়ে নাটকটি নির্মিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) সমাপ্তিকালে জার্মান এবং মিত্রশক্তির (ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া) মধ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন প্যারিসের ভার্সাই নগরীতে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ চার বছর ধরে মিত্রবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষতিপূরণ জার্মানের কাছ থেকে উসুল করা হয়। জার্মানির প্রধান শত্রু ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষোভ দমনে জার্মানিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই চুক্তি বা সন্ধির মূল উদ্দেশ্য বলা যায় জার্মানির উপর মিত্রবাহিনীর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। যার ফলস্বরূপ জার্মানির মধ্যে প্রতিশোধম্পৃহা জন্মায়। জার্মানের বিরুদ্ধে এই অপমানজনক চুক্তি, জাতীয় মর্যাদার অবমাননা, অর্থনৈতিক ধ্বংস ইউরোপকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে নিষ্ক্ষেপ করে।

রাষ্ট্রতান্ত্রিক স্বার্থের কারণে, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, যুদ্ধের প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক সামরিক নিয়োগ চালু করা হয়, যা সাধারণ জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। নির্দিষ্ট বয়সসীমার যুবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। যার কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছেদ, মৃত্যুর আশঙ্কা, মানসিক চাপ সাধারণ মানুষের জীবনে অভিশাপ রূপে নেমে আসে। এই করুণ পরিস্থিতির নিখুঁত ছবি 'সাদা পায়রার জন্য' নাটকটিতে তুলে ধরেছেন চন্দন সেনগুপ্ত। জার্মানিরা ফসারিদের যেভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, তাদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তার নিখুঁত বাস্তব চিত্র নাট্যকার আলোচ্য নাটকটিতে কলেজের অধ্যাপক অজয় রায় এবং তাঁর ছাত্রদের ক্রিকেট খেলা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন; যেখানে রমেন (অজয়ের বন্ধু) স্বাতীকে (অজয়ের স্ত্রী) কল্পনা করতে বলছেন যে, এই খেলার মাঠটিই হচ্ছে যুদ্ধ শিক্ষা শিবির আর ছাত্ররা হচ্ছে যুদ্ধসৈন্য। নাট্যকারের ভাষায়—

“রমেন: কলেজ নয়, — দেখুন যুদ্ধ শিক্ষা শিবির, ছাত্রদের হাতে ক্রিকেট ব্যাট নয়— দেখুন রাইফেল, — শুনুন যুদ্ধের শব্দ, চারপাশে রক্ত-মৃত্যু-কান্না...”^৩

নাটকের প্রথম দিকে আমরা লক্ষ্য করি ক্রুপ হাবিলদার পেরেড গ্রাউন্ডে জার্মান সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং দিচ্ছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে ইউস্কিন, ওয়েনেক্সি, জার্ডেন, শেলার। এরা নিজেদের স্বপ্ন, আশাকে বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়ে, নাটকের প্রথম অন্তর্দৃশ্যে জার্ডেনের চরিত্রে তা স্পষ্ট। জার্ডেন চেয়েছিল একজন বিখ্যাত চিত্রকর হতে মতিস, উৎরিল্লো, পিকাসোর (ফ্রান্সের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী) মতো। সে শিল্পকলার তীর্থভূমি ফ্রান্সে গিয়ে ছবি আঁকা শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু তার এই স্বপ্নের কথা শুনে হের হ্যামারম্যান তাকে বলেন যে যুদ্ধকালীন এই পরিস্থিতিতে শিল্পী হওয়া ছেলেমানুষী খেয়াল। দেশের এই জরুরীকালীন অবস্থায় তাকে যুদ্ধে নামতে হবে, ভার্সাই সন্ধির অপমানের জবাব দিতে হবে। নাট্যকার লিখেছেন—

“হ্যামার: ...জাতির স্বার্থে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। এতক্ষণে আমাদের অপরাজেয় সেনাবাহিনী পোলাণ্ডের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই আর্ঘ্য নিশান উড়াচ্ছে। জার্ডেন, দেশে জরুরী অবস্থা জারী হয়েছে, তোমার ঐ সমস্ত ইহুদি মানসিকতা ছাড়। এই মুহূর্তে জাতির স্বার্থে, তোমাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে,— তাই না?”^৪

জার্মান সৈন্য ওয়েনেক্সি হতে চেয়েছিল একজন নাবিক। নতুন নতুন দেশের নাবিকদের কাছ থেকে সমুদ্রের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার গল্পের সাগরে সে ডুব দিতে চেয়েছিল। আর ইউস্কিন হতে চেয়েছিল একজন ফুটবল প্লেয়ার। কিন্তু এই যুদ্ধ তাদের এই স্বপ্নকে ভঙ্গ করে দিল। তবে কেবলমাত্র জার্মান যুবকদেরই যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, তা কিন্তু নয়, ফরাসিদেরও তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়েছে, ফলত তাদের জীবনেও হতাশা, দুঃখ, আতর্নাদ, বিপদ ঘনিয়ে আসে। নাটকের দ্বিতীয় অন্তর্দৃশ্যে ফরাসি বন্দি ১-এর সাংসারিক জীবনের এক ঝলকই তার প্রমাণসাপেক্ষ। দিনমজুরি করা সামান্য এক চাষি, যে সংসারের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত। তার স্ত্রী যখন ছেলের রোজগারের সুখবর জানাবার জন্য বেশ উৎসাহিত, তখন চাষির উজ্জিতে হতাশার গভীর ছায়া পরিলক্ষিত হয়—

“বন্দী-১: আমাদের আবার সুখবর?

স্ত্রী: কেন, থাকতে নেই—

বন্দী-১: যাদের থাকে, আমরা তাদের দলের নই আমরা তো শুধু আজকের জন্যই বেঁচে আছি।”^৫

মাৎসের চর্বির সূপ আর লিভারের কাবাব রান্না করায় চাষি (বন্দী-১) তার স্ত্রীকে বলেছে যে এত খরচ কেন? কিন্তু যখন সে জানতে পারে যে এই খাবারের ব্যবস্থা তার সন্তানের প্রথম রোজগারে হয়েছে, আর মরিস তার বাবার জন্য তার প্রিয় চুরুট আর মার জন্য একখানা দস্তানা এনেছে তখন সে একটুও খুশি হতে

পারেনি, কারণ সে জানে যে, তারা শুধু সুখের স্বপ্ন দেখবে, সুখ পাবে না; যুদ্ধের কড়াল গ্রাস সেই সুখকে স্থায়ী হতে দেবে না। তাই তার আক্ষেপ—

“বন্দী-১: ...হা ভগবান, ছেলের প্রথম রোজগার, এখনও আমি কেন হাসতে পারছি না, খুশীতে কেন পাগল হয়ে যাচ্ছি না—”^৬

বাবা ও ছেলে দুজনকেই যুদ্ধে নাম লেখাতে হবে। আর সেজন্যই সুখ মুখ তুলে তাদের দিকে তাকালেও, দিন ফিরবার সময় এলেও চাষি একটিবার হাসতে পর্যন্ত পারল না।

ফরাসি বন্দিদের দুর্দশার মধ্যে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতম চেহারা ধরা পড়ে, যা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় সংগ্রাম হয়ে উঠেছে বন্দিদের জীবনে, যার ফলে মৃতদেহের পকেট থেকে খাবার চুরি করতেও কোনো দ্বিধা নেই তাদের। বন্দি-২-এর প্রিয় বন্ধু ছিল এলবার্ট। সে নিজস্ব ব্যবহারের জিনিস জার্মান সৈন্যদের কাছে বিক্রি করে রুটি জোগাড় করত; কারণ সে বাঁচতে চেয়েছিল তার প্রেমিকার জন্য, তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল বেঁচে থাকার। কিন্তু তার বন্ধু সেটা চায়নি। সে বারবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল এলবার্ট যেন না বাঁচে, সবাই জেগে উঠবার পূর্বেই যেন সে মারা যায়। কারণ এলবার্ট মারা গেলে সবার অলক্ষ্যে তার রুটির টুকরোগুলো সে খুব সহজেই বের করে নিতে পারবে। তাই সে নাড়ী ধরে বারবার দেখছিল ও মরে গেছে কি না। নাট্যকারের ভাষায়—

“বন্দী-২: ...ও মরতে চাইছিল না। হাড় জির জিরে বুকের ভিতর ওর হৃৎপিণ্ড থেকে থেকে নড়ে উঠছিল, গলা দিয়ে ঘর ঘর শব্দ হচ্ছিল, — ও মরছিল না। আমি প্রার্থনা করছিলাম ও মরুক—তাড়াতাড়ি মরুক, সবাই জেগে ওঠার আগে মরুক। ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর শরীরটাকে সরিয়ে দিয়ে রুটির টুকরোগুলি বের করে আনি... কিন্তু... কিন্তু ওর হাত কম্বল আঁকড়ে রেখেছিল, রুটির টুকরোগুলি দখলে রেখেছিল। ওর ঘোলাটে চোখে জল... ওর ঠোঁটের কষ বেয়ে লালা... তবু— তবুও বাঁচতে চায়... হা ঈশ্বর, তখনও বাঁচতে চেয়েছিল।”^৭

বেঁচে থাকাটাই যেখানে এত কষ্টের, সেখানে চিকিৎসার কথা ভাবাটা অতি হাস্যকর। সাধারণ রোগ হলেই তা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে পরিশেষে বন্দিদের মৃত্যুর কোলে পৌঁছে দিত। দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে বন্দিরা জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত হয় এবং তাদের সহনশীলতার সমস্ত বাঁধকে চুরমার করে দেয়। ক্ষুধা, রোগ ও মৃত্যুর করুণ বাস্তবতা কেবল ফরাসি বন্দিদেরই নয়, তা সমগ্র যুদ্ধবিধ্বস্ত মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করে। নাটকে দেখা যায়, বন্দি এলবার্ট আমাশায় ভুগতে থাকলেও কোনো চিকিৎসার উল্লেখ পর্যন্ত কেউ করেনি। এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতেও ফরাসিবন্দিরা বেঁচে থাকার আশায় দিন কাটাচ্ছে। তারা মরতে চায় না, তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায়। তারা এটা বিশ্বাস করে, যে, যুদ্ধ একদিন থামবেই। কারণ, রাষ্ট্রশক্তি নিজ স্বার্থে যুদ্ধ বাঁধাতে পারলে নিজ স্বার্থে যুদ্ধ থামাতেও পারে।

জার্মান ও ফরাসির যুদ্ধের পটভূমিতে ধ্বংস, বিদ্বেষ, রক্তপাত ও মানবিকতার অবক্ষয় যেখানে বীভৎস রূপ ধারণ করে; জাতি, রাষ্ট্র ও ক্ষমতার লড়াইয়ে মানুষ মানুষকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে; সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে এলবার্ট ও কোজেথের ভালোবাসা সমস্ত রাজনৈতিক বিভাজন, শত্রুতা, জাতিগত পরিচয় ও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করে মানবিকতার পর্যায়ে উন্নীত করে। তারা একে অপরকে মানুষ হিসেবে দেখে, শত্রু-জাতি ফরাসি কিংবা জার্মান হিসেবে নয়। তবে তাদের মনে এক আশঙ্কাও কাজ করে— যদি ফরাসি কিংবা জার্মান বলে একে অপরকে হারিয়ে ফেলে। আর সেজন্যই কোজেথ ফ্রান্সের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে চায়, বুঝতে চায় সেখানের লোকজনের বিষয়ে, তাদের সংস্কৃতির বিষয়ে। তাই সে ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে শুরু করে সাহিত্য সবকিছুই পড়ে ফেলে। তারপর সে বুঝতে পারে—

“...সব দেশের গভীরে যে সত্তা কাজ করে যায় তা এক এবং অভিন্ন, বাইরের চমক আর বিভেদের আড়ালে তাকে চেনা যায় না, ধরা যায় না।”^৮

যুদ্ধকালীন অমানবিক পরিবেশ এলবার্ট ও কোজেথকে আলাদা আলাদা দেশের বাসিন্দা বলে স্থির করলেও তাদের ভালোবাসাকে শেষ করে দিতে পারেনি। তাদের এই সম্পর্ক এটা প্রমাণ করে যে যুদ্ধ মানুষের শরীরকে বন্দি করতে পারে কিন্তু হৃদয়কে নয়। কোজেথ এলবার্টকে নিয়ে আলাদা এক পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেছে— যেখানে যুদ্ধ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, জাতিগত কোনো বিভেদ নেই; যেখানে সবাই কেবলমাত্র মানুষ। নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত এলবার্ট ও কোজেথের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের জয়গান ঘোষণা করেছেন। তাদের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা-বিশ্বাস-ত্যাগ এবং তাদের মানবতাবোধ যুদ্ধের সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে ছাপিয়ে যায় এবং প্রমাণিত হয় যে রাজনৈতিক যুদ্ধ যতই মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করুক না কেন, মানবিক অনুভূতিকে ধ্বংস করতে পারে না।

যুদ্ধকালীন ভয়াবহ পরিস্থিতি, বন্দিজীবনের নির্মম বাস্তবতার পাশাপাশি আলোচ্য নাটকে আমরা জার্ডেন চরিত্রে এক প্রতিবাদী সত্তা লক্ষ্য করি। যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তার চিন্তাধারা যুদ্ধের বিপরীতমুখী। নাটকের আদ্যোন্ত জুড়ে জার্ডেনের প্রতিটি উক্তিই যেন নির্মম সত্যকে তুলে ধরে। প্রথম অন্তর্দৃশ্যে হের হ্যামারম্যানের সঙ্গে কথোপকথনকালে তার উক্তিতে এক দৃঢ় স্বর ভেসে ওঠে। দেশের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বললে সে জানায় যে কেন এই যুদ্ধ আর এর পরিণতি কী? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা যদি জার্মান জাতির অপমানের বদলে হয়ে থাকে তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কোন অপমানের ফলে সৃষ্টি। যারা ইহুদি, তারা ঘৃণ্য আর তারাই আর্য জাতির শত্রু— একথা মানতে সে নারাজ। সে জানতে চায় যে কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ, মানুষের মূল্যবোধ, মানবিকতার কি কোনো দাম নেই। জার্ডেনের উক্তি—

“জার্ডেন: কিন্তু যুদ্ধে যাবার আগে একটা কথা আমি স্পষ্ট জানতে চাইবো মা, কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কে আমাদের শত্রু এবং কেন? আমি জানতে চাইবো এই যুদ্ধে জাতির মঙ্গল কোথায়...?”^৯

দেশের প্রতি সৈনিকদের যে কর্তব্য, শ্রদ্ধা বা প্রেমকে রাষ্ট্রশক্তি নিজস্বার্থে অন্ধ আনুগত্যে পরিণত করতে চায়। যুদ্ধ-শিক্ষাশিবিরে প্রতিনিয়ত তাদের পশুর মতো গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা কোনোরকম যুক্তি, বিবেক, নৈতিক বিচার ছাড়াই রাষ্ট্রের আদেশ মেনে চলে আর অনায়াসেই মানুষকে হত্যা করতে পারে। জার্ডেনের উক্তিতে আমরা দেখতে পাই—

“মনে হয়—দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসাকে কাঁচামালের মত ব্যবহার করা হচ্ছে— ব্যবসার জন্যে।”^{১০}

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যোদ্ধাদের শত্রুর যন্ত্রণা ও মৃত্যুতে সহানুভূতি দেখানোকে দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর বিপরীতে শত্রুকে হত্যা করাই গৌরবের কাজ বলে শেখানো হয়, যাতে মানবিক অনুভূতিগুলির জায়গায় ঘৃণা, প্রতিশোধ ও সহিংসতা জন্ম নেয়। অর্থাৎ বলা যায়, যে, যুদ্ধ কেবলমাত্র প্রতিপক্ষকেই ধ্বংস করে না বরং যোদ্ধার মনুষ্যত্বকেও গ্রাস করে ফেলে। দেশপ্রেমের নামে সৈনিকদের ‘মানুষ হত্যার যন্ত্র’ বানিয়ে তোলা হয়। নাটকে দেখা যায় জার্ডেন ও তার সাথীরা বুঝতে পারে যে, ধীরে ধীরে তারাও পাল্টে যাচ্ছে— মনুষ্যত্ব হারিয়ে জন্তুর মতো নিষ্ঠুর, নির্দয়, রুঢ় হয়ে উঠছে। এভাবেই তাদের তৈরি করা হচ্ছে যাতে খুব সহজেই তারা মানুষকে হত্যা করতে পারে, এবং মনের বোধ, চিন্তা বিরাট প্রশ্নের আকারে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। দেশকে রক্ষা করার জন্য যোদ্ধারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারা মনে করে দেশের বীর গাঁথায় তাদের নাম থাকবে; কিন্তু দেশপ্রেমই যখন তাদের বিবেক, সহানুভূতি, স্বাধীন

চিন্তাধারার অধিকার কেড়ে নেয় তখনই সেই দেশপ্রেম পীড়নে পরিণত হয়। জার্ডেনদের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে, সেজন্যই তারা যুদ্ধের এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, উন্মুক্ত পৃথিবীতে স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চায়। কিন্তু এই পৃথিবীও 'আমি বনাম তুমি'-তে বিভক্ত; জাতি, ধর্ম, দেশ, শ্রেণি, ক্ষমতা— এই সবকিছুর মূলেই এই ভাবনা বিদ্যমান। পারস্পরিক শত্রুতা, অহং, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা অথও পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের চেতনায় 'আমি' এবং 'তুমি'র এক বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে। শিশুকাল থেকেই আমাদের এভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। জার্ডেনের কথায় তা স্পষ্ট—

“জার্ডেন: মাটির পৃথিবী আমি আর তুমিতে বিভক্ত— খণ্ডিত।

ইউস্কিন: তাতো হবেই।

জার্ডেন: কেন হবে?

ওয়ে: তা আমি জানি না।

জার্ডেন: আমরা কেউ জানি না। শুধু মেনে নিই, অনুভূতি গুলিকে সেইভাবেই শিক্ষিত করা হয়েছে।”^{১১}

ইচ্ছে করলেও সৈনিকরা যুদ্ধের নৃশংস এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এখানে বাঁচার একটিমাত্র পথ-ই খোলা, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গুলি করার আগে শত্রুকেই গুলিবিদ্ধ করা।

জার্মান হয়েও জার্ডেনের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী মনোভাব আমরা লক্ষ্য করি, যে সে জার্মান জাতির ঘোর শত্রু ফরাসি বন্দিদের শত্রু বলে বিবেচনা করে না, তাদের মধ্যে সে আপনজনকে খুঁজে পায়। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের খাবার দেয়, তাদের সাথে কথা বলে। সে তাদের নিজেদের মতোই মানুষ বলে গণ্য করে। তার এই সহানুভূতিশীল দৃষ্টি, মনুষ্যত্ববোধ আলোচ্য নাটকে যুদ্ধের প্রতি নীরব প্রতিবাদকে দর্শায়। জার্মান সৈনিক বলে রাষ্ট্রের আদেশ পালন করা তার কর্তব্য। কিন্তু ফরাসি বন্দিদের ওপর অমানবিক আচরণ করতে গিয়ে তার মধ্যে গভীর বিবেকের সংঘাত দেখা যায়। নাটকের শেষে দেখা যায় যে হাবিলদার জার্ডেনকে কোয়াটার গার্ডে বন্দি করে রাখে। কারণ তাকে বেশ কিছুদিন যাবৎ বন্দি শিবিরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এবং তাকে শত্রুর গুলিচর বলে সন্দেহ করা হয়েছে। যাই হোক, জার্মান সেনাদের দেশপ্রেমকে যেভাবে যান্ত্রিক ও নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে জার্ডেন পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেনি। ফরাসি বন্দিদের সঙ্গে জার্ডেনের সম্পর্ক যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রূপ নেয়। তার এই দৃষ্টিভঙ্গী 'আমি বনাম তুমি' বিভাজনের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ। জার্ডেনের এই কার্যকলাপ হাবিলদার ভালো চোখে নিতে পারেনি। নাটকে আমরা ইউস্কিনকে বলতে দেখি—

“...ঐ হাবিলদারটা তোর দিকে সবসময় কেমন সন্দেহ নিয়ে তাকায়। ...ও তোর চোখে নাকি সব সময় নীরব বিদ্রোহ দেখতে পায়।”^{১২}

মানবিকতার স্পর্শ নাটকে বন্দি-১-এর চরিত্রেও আমরা লক্ষ্য করি। যুদ্ধের নিষ্ঠুর পরিবেশ, অনাহার, অপমান, অনিশ্চিত মৃত্যুর ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও মানবিক মূল্যবোধকে সে আঁকড়ে ধরে থাকে। যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও মানুষ হয়ে থাকার সংগ্রাম সে চালিয়ে যায়। জার্ডেনের মতো সেও প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে করে না। কারণ সে জানে যে তারা সবাই সাধারণ জনগণ; আর সাধারণ জনগণেরা কখনোই যুদ্ধ বাঁধায় না এবং তারা একে অপরের শত্রুও নয়। যুদ্ধের আগে সাধারণ মানুষ তা ফরাসিই হোক বা জার্মানই হোক সবাই নিজস্ব জীবন-যাপনে ব্যস্ত; কেউ চাষি, কেউ মজুর, কেউ আবার স্কুল শিক্ষক। প্রত্যেকের মধ্যে অবস্থিত ভালোবাসা, বেদনা, আশা, ভরসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে গভীর করে তোলে। এবং এই শান্তির সময়ে দেশ বা জাতির পরিচয় থেকে মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের স্বাভাবিক ভিত্তিই বড় হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ যুদ্ধের নিষ্ঠুর বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ চারদিকে বিরাজ করে।

তবে শান্তি কেবলমাত্র এখানে যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, বরং তা মানুষের প্রকৃত মানবিক সত্তার প্রকাশ। তাই বন্দি-১-এর প্রশ্ন জার্মান সেনাদের কাছে—

“শান্তির সময়ে আমরা সবাই বন্ধু, —তাই না? ...কেন আমরা হঠাৎ শত্রু হয়ে যাই? বল—
কার ইচ্ছায়? কার প্রয়োজনে?”^{১৩}

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বন্দি-১এর মানসিকতাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেখানে সে যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে জাতি ও রাষ্ট্রের উর্ধ্বে মানুষকে দেখতে পায়। তাই জার্মান সৈন্যদের সে নিজ সন্তান বলে ভাবে। বিশেষ করে জার্ডেনের মধ্যে সে তার মরিসকে খুঁজে পায়। আর তাই হয়তো বন্দি-২ এর কথামতো সে জার্ডেনের কাছে খাবার ভিক্ষা করতে রাজি হয়নি এই ভয়ে, যদি তাদের সম্পর্কের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটে, যদি জার্ডেনের দৃষ্টিতে সে কেবলমাত্র একজন যুদ্ধবন্দি হয়ে যায়। জার্ডেনের চোখেই সে তার আসল পরিচয় খুঁজে পায়; আর তা হল তার পিতৃত্বের পরিচয়। পিতা হয়ে সে সন্তানের কাছে কোনোমতেই ভিক্ষা করতে পারবে না। সেজন্যই পিতা হয়ে পুত্র-সমান জার্ডেনকে বন্দি করে রাখার কথা যখন সে জানতে পারে তখন সে রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে রাষ্ট্র, শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতালোভী শক্তিকে যারা যুদ্ধ বাঁধায় তাদের ধিক্কার জানায়, অভিশাপ দেয়।

“...আমি অভিশাপ দিই—যারা যুদ্ধ বাধায় আমি তাদের মুখে থুথু ছিটাই। আমি ওদের ঘেন্না করি। ...আমার বয়স ১৪। বাবা ছিল—মা ছিল—জমি ছিল—সুখ ছিল। কিন্তু— কিন্তু একদিন যুদ্ধ এলো—জ্বলে উঠলো দেশটা। বাতাসে বারুদের গন্ধ। জিনিসের দাম ছ ছ করে বেড়ে উঠতে লাগল। অভাব— শুধু অভাব। এক মুঠো খাবারের জন্যে মানুষ কাজ করতে রাজি হতো। বাবা যুদ্ধে গেলেন, —আর এলেন না। ...হঠাৎ হঠাৎ মা যেন কোথায় চলে যেত। যখন ফিরে আসতো— হাতে থাকতো খাবার— চোখে জল। ...”^{১৪}

অর্থাৎ যুদ্ধের নিষ্ঠুর পরিহাস কেবলমাত্র রণাঙ্গনে সৈনিকদের জীবনকেই ধ্বংস করেনি, তা জনসাধারণের ঘরের ভেতর পরিবারের বুকেও প্রবল আঘাত হানে। বন্দি-১ চরিত্রটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুর বাস্তবতার জীবন্ত দলিল। মানুষের সভ্যতার আসল চেহারা তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধই শিখিয়েছে। তার ১৪ বছর বয়সে ঘটা এই যুদ্ধ ও তার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে সে বুঝতে পারে যে যুদ্ধ আসলে সাধারণ মানুষের নয়, তা ক্ষমতাবান রাষ্ট্র ও শাসকদের স্বার্থরক্ষার লড়াই। এই লড়াই ধীরে ধীরে পুরো দেশটাকেই গ্রাস করে ফেলে। চারিদিকে দেখা দেয় কেবল অভাব; একমুঠো খাবারের জন্যে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমে আসে। দেশপ্রেমের নামে পুরুষদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়ায় তাদের সংসার হয়ে পড়ে অচল। এই অসহায় পরিস্থিতিতে সংসার চালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নারীদের ওপর এসে পড়ে। চারিদিকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্তানকে বাঁচাতে, একমুঠো খাবার যোগান দিতে গিয়ে নারীদের আত্মসম্মানকেও বিসর্জন দিতে হয়। যুদ্ধকালীন এই করুণ পরিস্থিতি ফরাসি বন্দির পরিবারকেও ধ্বংস করে দেয়। ফরাসি বন্দির এই তিক্ত অভিযোগের মাধ্যমে নাট্যকার যুদ্ধের আসল চেহারাকে আলোচ্য নাটকে নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

‘সাদা পায়রার জন্য’ নাটকের নামকরণের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় যে, নাটকের বিষয়বস্তু, ভাবধারা ও মানবিক বার্তার সঙ্গে নামটি সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বব্যাপী সাদা পায়রা শান্তি ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। আলোচ্য নাটকেও সাদা পায়রা বাস্তব কোনো পাখি নয়, তা আসলে শান্তির বার্তা। এই নাটকটি জাতিগত বিদ্বেষ, অন্ধ দেশপ্রেমের বিপরীতে মানবিকতাই যে মানুষের প্রধান ধর্ম তার বার্তা বহন করে। বন্দিশিবিরে ফরাসিরা ক্ষুধা, নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুভয়ের মধ্যে জীবন যাপন করেও যুদ্ধ কবে থামবে এই আশায় দিন গুনছে; অর্থাৎ শান্তির জন্য তাদের মনে তীব্র আকুলতা, আর

এই আকুলতারই প্রতীকী রূপ হচ্ছে সাদা পায়রা। তারা এইকথায় ব্যস্ত নয় যে, শত্রুপক্ষকে হারিয়ে তাদের দেশ জয়ী হোক। যুদ্ধের নিয়মকে অস্বীকার করে জার্মান জার্ডেন ও ফরাসি বন্দি-১-এর মধ্যে যে নীরব মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই সম্পর্কই যুদ্ধের বিভাজন, আমি ও তুমির নির্মম দেয়াল ভেঙে মানবিক আর্তি ও শান্তির জয়গান ঘোষণা করছে। ক্ষমতালোভী, পাশবিক রাষ্ট্রশক্তি বার বার এই পৃথিবীর বুকে আঘাত হানে। যার প্রতিরোধের জন্য নাট্যকার নাটকের প্রথম দিকে একটি পোষ্টারের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করেছেন— 'যুদ্ধ নয়— শান্তি চাই'। আর এই শান্তির জন্যই নাট্যকার উদ্যম যৌবনকে আহ্বান জানাচ্ছেন যে, ক্ষমতালোভী-বর্বর শাসকগোষ্ঠী, আমি-তুমির দ্বন্দ্ব, জাতিগত বিভাজন, ধর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, যাতে সমগ্র বিশ্বে ভালোবাসা-বিশ্বাস-ক্ষমার মহান মিলন ঘটে। আর এই মিলনের মাধ্যমেই চতুর্দিকে শান্তি বিরাজ করবে। রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে যে যুদ্ধ, এই যুদ্ধ কোন স্বার্থে বা কাদের মধ্যে এই যুদ্ধ যার জন্য সাধারণ মানুষদের আশা, স্বপ্ন, ভালোবাসা তথা জীবনকে বলি দিতে হয়, তার মুখোশ খুলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নাট্যকার তরুণ প্রজন্মকে আরেকটি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেছেন; যে যুদ্ধ হবে শান্তির যুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ, নতুন পৃথিবী গড়ার যুদ্ধ। নাট্যকার লিখেছেন—

“সবাই মিলে একবার যুদ্ধের দৈত্যটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ছিঁড়ে ফেলি ওর মুখোস। তাহলেই আমরা জানবো— কার জন্যে এই সব। তাহলে আমরাও পারবো যুদ্ধ করতে। যে যুদ্ধ— প্রতিরোধের যুদ্ধ। যে যুদ্ধ— জীবনকে বাঁচাতে। ... দিন আসছে পালা বদলের দিন।”^{১৫}

'সাদা পায়রার জন্য' নাটকটি ত্রিপুরা তথা সমগ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন। যেখানে নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত কেবল যুদ্ধের কথাই বলেননি, বরং যুদ্ধের গভীরে লুকিয়ে থাকা মানবিক বেদনা, প্রেম, প্রতিবাদ ও শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পসন্মতভাবে প্রকাশ করেছেন। নাটকের নামটি শোনা মাত্রই পাঠক ও দর্শকের মনে কোনো যুদ্ধের কথা আসে না বরং এক শান্তির সুর বেজে ওঠে। জাতিগত বিভেদ, সংঘাত, হিংসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতার প্রাচীর ভেঙে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, বিবেক, সহানুভূতি ও জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আন্তরিকভাবে পরিবর্তন করে সমগ্র বিশ্বে শান্তির বীজ বপন করতে নাট্যকার 'সাদা পায়রার জন্য' নাটকে সাদা পায়রাকে প্রতীকী রূপে গড়ে তুলেছেন— যা যুদ্ধের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সমগ্র জনজাতিকে আলোর সন্ধান দেয়। এলবার্ট ও কোজেথের ভালোবাসার স্মারক— এলবার্টের ডায়েরি এই আলোর দিশারি হয়ে জার্মান সৈন্যদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে যে একটা সত্তা আছে তা জাগিয়ে তোলে। জার্ডেনদের পাশবিক বৃত্তিতে নিয়োজিত করে তাদের পশুর মতো বানিয়ে তোলার যে প্রয়াস চলছিল সেই প্রয়াসকেও ব্যর্থ প্রমাণিত করে তাদের মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

১. হালদার, শক্তি (সম্পা.)। ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা। দেবকুমার বসু (প্রকাশক) প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০২, পৃ- ৩৫৬।
২. তদেব, পৃ- ২৪৮।
৩. ভট্টাচার্য, বিভূ (সম্পা.)। ত্রিপুরা থিয়েটার পত্রিকা। ঊনবিংশতিতম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৪, পৃ- ৩৬৬।
৪. তদেব, পৃ- ৩৭২।
৫. তদেব, পৃ- ৩৭৮।
৬. তদেব, পৃ- ৩৭৯।

৭. তদেব, পৃ- ৩৭৭।
৮. তদেব, পৃ- ৩৮৬।
৯. তদেব, পৃ- ৩৭৪।
১০. তদেব, পৃ- ৪০৬।
১১. তদেব, পৃ- ৩৯৫।
১২. তদেব, পৃ- ৪০৬।
১৩. তদেব, পৃ- ৪১৬-৪১৭।
১৪. তদেব, পৃ- ৪১৫।
১৫. তদেব, পৃ- ৪১৭।